বাস্তব - অবাস্তব

চন্দ্রা মজুমদার

ফোনটা কানে চেপে ধরেই বুঝতে পারে ডেড, তা সত্ত্বেও আরও কিছুক্ষণ চেপে ধরে রেখে বিরক্ত হয়ে নামিয়ে রাখে। কারো দেখি কোনও মাথাথ্যথা নেই। সবাই তো আর ওর মতো ব্যস্ত নয়। তবে সময়মতো ডাকেটটা করতে এত গড়িমসি কিসের। অস্থির সুনন্দ ভারি চিন্তায় পড়ে যায়, এখন তার বেরিয়ে পড়ার কথা— যেখানে যাবে সেখানে নিশুতি গাঁয়ে ফোনটোন থাকবে ভাবাই যায় না অথচ নীলার সঙ্গে একবার কথা না বললেই নয়! কি যে অবুঝ! খেয়েদেয়ে আহ্লাদিপনা করে ঘুরে বেড়ানো ছাড়া তার কাজটা কি? আর সে? এই চাকরিটা জুটেছে অনেক কাঠখড় পুড়িয়ে—দীর্ঘ বেকারিত্ব যে কি বস্তু! আর আশ্চর্য, মাও কেমন যেন আমল দিতে চান না। বরং সুনন্দ অধৈর্য হয়ে ছটপট করছে দেখলে বলেন— 'পড়াশুনা নিয়ে থাক না, চাকরি না করলে কি খেতে পাবি না? আমার চাকরিটা তো আছে।' মা সেই পুরনো দিনের ধারণার মধ্যেই আটকে আছেন। এম.এ.টা পাশ না করলে নাকি মুখ্যু নাম ঘোচানো যায় না। কি অদ্ভুত ধারণা। ওর বন্ধু শ্রবণদের অবশ্য অনেক টাকা। এখানে বিশেষ কিছু হবে না জেনে বাবা থোক লাখ দুয়েক দিয়ে বাঙ্গালোরের কি একটা ইঞ্জিনিয়ারিং কোর্সে ভর্তি করে দিয়েছেন। এত দিনে ওপর পড়াও শেষ হয়ে এল। হয়তো ওখানেই কাজ পেয়ে যাবে। ওর বিদেশ যাবার প্ল্যানও আছে। একটা নিঃশ্বাস ফেলে তাড়াতাড়ি বাথরুমে ঢুকে যায় সুনন্দ।

টেবিলে মা চা-খাবার নিয়ে বসে। সুমিটা কুঁড়ে। প্রথম ডাকে একপাশ ফিরে শোয়। দ্বিতীয় ডাক হয়তো শুনতেই পেল না। তৃতীয় ডাকে আর একপাশ। এরকম করে বিছানা আঁকড়ে পড়ে থাকবে যতক্ষণ না মা বা দাদা এসে ঠেলে তুলবে। মেয়েরা বোধহয় এই রকমই হয়। কাণ্ডজ্ঞানশূন্য। না; আজ নির্ঘাত দেরি হয়ে যাবে। যদি একটু তাড়াতাড়ি বের হতে পারে। বাইরে থেকে যেভাবেই হোক নীলাকে ধরতে হবে, দেখা করা সম্ভব নয়, ফোনেই জানাতে হবে তার ব্যস্ততা। তা না করলে ফালতু রাগারাগি করে মেজাজটা খারাপ করে দেবে। বিরক্ত গলায় মুখ মুছতে মুছতে সুনন্দ বলে— 'তুমি সুমিকে বড্ড বেশি আসকারা দিচ্ছ না। দেখো যথেষ্ট বড় হয়েছে, বিয়ে তো হবেই, কার ঘাড়ে পড়বে লাইফ একেবারে হেল হয়ে যাবে।' ওকে তাড়াতাড়ি চা নিয়ে বসতে দেখে মা এবার নিজেই মেয়েকে ডাকতে গেলেন। একটু মনঃক্ষুণ্ণ হলেন বোধহয়। বোন যে দাদার ডাকাডাকি, ধমক-ধামক শুনবে বলেই সকালবেলা এইরকম করে মা তা বেশ বোঝেন। ওদের এই খুনসুটি দেখলে ভারি ভালো লাগে। মনে হয় এরা সেই ছোটটিই আছে। নিজের জন্য সারাদিনের বা সারাজীবনের একঘেয়েমি তো আছেই। মায়ের আবির্ভাবে সুমি কিছু বুঝে ফেলে তাড়াতাড়ি টেবিলে আসে।

অকারণ গলা চড়িয়ে সুনন্দ বলে— 'সারাদিন করিস কি, অ্যাঁ? ফোনটা কবে থেকে ঠিক নেই, খবরটাও দিতে পারিস না, না? কত অসুবিধা হয় জানিস?'

সুনন্দ যেন খানিকটা সচেতন হয়ে পড়ে। ঠিকই বলেছে সুমি। সারাদেশেই তো এখন তৎপরতা। অফিসে অফিসে চেয়ার-টেবিল খালি। যারা আছে শুধুই মুখে ভোটের কথা। এসব যে ও জানে না তা নয়। কিন্তু মাথায় নেই ওসব তাই অবাক হবার ভাব এল মুখে, কথাগুলো যেন প্রথম শুনল। — 'তাই বল!' একটু খোঁচা দেওয়ার ভঙ্গিতে বলে, 'অফিসারটাকে কেমন দেখলি! তোর কথা নির্ঘাত শুনবে কি বল।' হঠাৎ ফোনটা বেজে উঠল। সুমি সামনে থাকাতে ওই গিয়ে ধরল। — 'হ্যালো! হ্যাঁ, বুঝেছি...ও...ও আচ্ছা দাদাকে ডেকে দিই?...ব্যস্ত, ঠিক আছে, আমি এক্ষুনি বলে দিচ্ছি।' সুনন্দ চায়ে চুমুক দিতে ভুলে যায়। দমবন্ধ করে অপেক্ষা করে। সুমি ধীরেসুস্থে এককামড় বাটার টোস্ট খেয়ে চায়ে চুমুক দিয়ে গলাটা পরিষ্কার করে নয়। তারপর বলে— 'নীলাদিরা ডায়মন্ডহারবারের দিকে পিকনিক করতে গেল মস্তদল। বলল, ওদের বাড়িতে এখন অনেক লোকজন, তুমি যেও না, ও পরে ফোন করবে।'

সমস্ত ব্যস্ততা যেন মুহূর্তেই শেষ হয়ে গেল। আর কোনও কাজ নেই। সদ্য জয়েন করেছে বিজ্ঞাপনের অফিসে। ভালো কাজ দেখাতে পারলে অনেক উপরে ওঠা যায়। এ সরকারি অফিস নয় যে যত বুড়ো হবে আপনি আপনি প্রমোশন পেয়ে ওপরে উঠতে থাকবে। সুনন্দ লেখে ভালো, চ্যালেঞ্জ নিয়ে কাজ করতে ভালোবাসে। আর তার উলুবেড়িয়া যাবার কথা। সকাল থেকেই ব্যস্ততা শুরু হয়েছে সেইজন্য। ওদিকে নীলাকে জানাতে হবে অথচ ফোন ঠিক নেই। তাড়াতাড়ি বের হতে হবে। কোনও একটা বুথে ঢুকতে হবে। তারপর তিনি আবার মেজাজ দেখাবেন কিনা— এসব ভাবতে ভাবতে উত্তেজনা বাড়ছিল, নতুন কাজের ব্যাপারটা তো আছেই। এইমাত্র বোনের কাছে যে সংবাদ পেল তাতে আপাতত ব্যস্ততার আর কোনও কারণ নেই। নীলার অভিমানের এতটা মূল্য তার কাছে অথচ ওর সমস্ত আবেগ অধীরতা আকর্ষণ — সেখানে আজ নীলা যেন আজ একটা দাঁড়ি টেনে দিল।

একটু বেশি সময় নিল স্নানের ঘরে। অন্যমনস্কতার কারণে বার দুই সাবান বুলিয়ে ফেলল গায়ে, শাওয়ারের তলায় দাঁড়িয়ে রইল কতক্ষণ, একটু শীত শীত করতে হুঁশ ফিরে এল। তাড়াতাড়ি বেরিয়ে দেখল সুমি খাটের উপর আকাশনীল শার্টটা বের করে রেখেছে। শার্টটা হাতে তুলতেই মনে হল নীলা এই রংটা খুব পছন্দ করে। ভাবতেই শক্ত হয়ে গেল ভিতরটা, হাঁক দিয়ে বলল— 'এই সুমি, স্ট্রাইপ শার্টটা দে,' নিজেই এক যুক্তি খাড়া করে দিল অকারণেই। 'সারাদিন ধুলোবালিতে ঘোরাঘুরি হবে, এ জামা একেবারে যাচ্ছেতাই হয়ে যাবে।' মার মুখখানা একেবারে ক্লান্ত, তাকে

সৃষ্টিসন্ধান

বলার মত কিছু নেই, শেষে ভেবে বলল, 'আমার ফিরতে দেবি হবে হয়তো, তোমরা খেয়ে নিও।' সব কাজ হঠাৎ যেন ফুরিয়ে গেছে এমন একটা ভাব নিয়ে পথে নামল। দাঁড়িয়ে না থেকে বাসস্ট্যান্ডের দিকে এগোতে থাকে সুনন্দ। হাওড়াগামী বাসটায় ভিড় দেখে ছেড়ে দিল। অ্যাটাচি খুলে কাগজপত্র একবার চেক করে নিয়ে দাঁড়িয়ে পড়ল পরবর্তী বাসের অপেক্ষায়।

নীলা কি ছেলেমানুষ? ওর আচরণ দেখলে এক এক সময় মনে হয় বড়ই অপরিণত। ছেলেবেলাটা কেটেছিল ওদের একই পাড়ায়, তখন অবশ্য কেউ কাউকে খেয়াল করেনি। কেন করেনি? তথাকথিত বড়লোকের একটি দেমাকি ঝগড়াটে মেয়েকে কখনওই বন্ধু বা খেলার সাথী ভাবা যায় না। ওর উদ্ধত আচরণের জন্য কারো সাথে বেশিদিন ভাব বজায় থাকত না। কলেজ থেকে ফেরার সময় সুমি সেদিন একটি মেয়েকে বাড়ি নিয়ে এল। সুনন্দ ঢুকেই দেখল হলদে শাড়ি পরা একটি মেয়ে ওর মায়ের সঙ্গে কলকল করে কথা বলে যাচ্ছে। কে মেয়েটি চিনতে পারল না কিন্তু চেনা মনে হল ওর ঢোঁক গিলে গিলে কথা বলার ভঙ্গিতে। সুমি সবে ফার্স্ট ইয়ারে ভর্তি হয়ে হয়েছে আর ও মেয়েটি পড়ে থার্ড ইয়ারে। — 'এমা ওকে চিনতে পারলি না দাদা। মা কিন্তু চিনে ফেলেছে।' দাদা সুনন্দ তখনও হাঁদার মতো দাঁড়িয়ে আছে, মেয়েটি হঠাৎ বলে উঠল, 'ও দাদা নন্দ, গায়েতে গন্ধ' —বলেই খিলখিল করে হেসে উঠল। ও সেই লাল নীল। নীলাকে ওরা ওই নামে খেপাত তা সব মনে পড়ে যায়। শ্যামপুকুরে ওরা ঠিক পাশাপাশি বাড়িতেই থাকত। তারপর এজমালি বাড়ি ছেড়ে ওর বাবা কোথায় যেন নতুন বাড়ি করে চলে গিয়েছিলেন। সুনন্দরাও নানা জায়গায় ঘুরতে ঘুরতে এখানে এসেছে। সামান্য হলেও বাড়িটুকু মায়ের আপ্রাণ চেষ্টাতেই হয়েছে। এই নীলা একটি পরিপূর্ণ নারীমূর্তি। পূর্বপরিচয়ের সূত্র ধরে এ বাড়িতে এসেছিল ঠিকই কিন্তু নীলা ভাবেনি আজকে সুনন্দ এমন একজন উজ্জ্বল মানুষ। একদিনের দেখা আর অনেক দেখার আগ্রহ জাগিয়ে তোলে, ছুতোনাতার দরকার হল না—অভিভাবকেরা চিন্তিত হলেও না। নীলার মা ভাবলেন সুন্দর শিক্ষিত ছেলে একটা চাকরি-বাকরি পেতে আর কতদিন লাগতে পারে? সুনন্দর মাও মনে মনে খুশি হলেন। সম্পন্ন বাড়ির সুশ্রী শিক্ষিতা মেয়ে, ছেলেবেলাতেও ওকে দেখেছেন, অতঃপর। অবশ্য ছেলে প্রতিষ্ঠিত নয়। তবে চিন্তার কিছু নেই। তার দায়িত্বশীল বুঝদার ছেলে—ভাবনাচিন্তা না করে কিছু করবে না সে।

দাঁড়িয়ে থাকতেই সব অস্থিরতা চলে গেল। হাওড়ার বাসটা এসে দাঁড়াতেই তাড়াতাড়ি উঠে পড়ল। 'অফিসটাইম' যাকে বলে এখন তা নয়। মোটমুটি খালি বাসটায় সামনের দিকে এগিয়ে গিয়ে জানালার ধারে বসে পড়ে। ঠাণ্ডা হাওয়ায় মনটা আরো শান্ত হয়ে যায়। কলকাতা এখনও ঘুমিয়ে আছে। দু-একজন ফেরিওয়ালা জাতীয় লোক রাস্তার দোকান সাফসুতরো করছে। বিরাট বিরাট অফিস-বাড়িগুলোর দরজা-জানলা বন্ধ, নিঃঝুম। দু-একটি ভিখারি বা ভবঘুরে এইসব প্রাসাদ আঙিনায় অকাতরে ঘুমোচ্ছে। বাসটা চলছে খুব ভালো। একবার ময়দানের বাঁক নিতেই সবুজ গাছের সারির মধ্য দিয়ে স্নিগ্ধ হাওয়ায় দিনের আরম্ভটা সুন্দর হয়ে উঠল। ক্লাবঘরগুলোর সামনে ছোট ছেলেদের জমায়েত। ছোট ছোট দলে ওরা ক্রিকেট খেলছে নয়তো বল নিয়ে ড্রিবলিং করছে। ওদের দৌড়োদৌড়ি এবং হাবভাব বিজ্ঞ খেলোয়াড়দেরই মত। ওদের মধ্যে নিজেকে যেন আবার খুঁজে পায় সুনন্দ। রাজভবনের গম্ভীর বাড়িটা পেরিয়ে যেতে যেতে ঘাড় তুলে গেটের সিংহ আর স্পিংকসের মূর্তি দেখতে ভোলে না, অসম্ভব ভালো লাগে। গ্রিস রোমের পুরাণ কথার পাতাগুলো এক এক করে সামনে খুলে যায়— সেই এথেন্সের নগরদ্বারে বসে আছে এই মূর্তির জীবন্ত রূপ। আর প্রশ্ন করে চলেছে একের পর এক। সেই ভালোলাগার বয়সে কেউ সম্ভাব্যতার কোনো প্রশ্ন তোলে না— ও গ্রিস রোমের পুরনো কাহিনী যেমন বিশ্বাস করে তেমনই জাতীয় পুরাণ কাহিনী— তাদের দেবদেবীর গল্প। বোধহয় বিশ্বাসের মধ্যেই থাকতে সব ভালোলাগে। যবে থেকে যুক্তির উদয় হয়েছে অবিশ্বাসের প্রশ্নচিহ্ন দীর্ঘ থেকে দীর্ঘতর হয়েছে, বাড়িয়েছে সংশয়। বাস হাওড়া ব্রিজেউঠে পড়ল। এমন নির্মল হাওয়া একমাত্র গঙ্গাতেই বয়। স্বর্গ থেকে ভগীরথ সেখানে সেচবিভাগের কোনও ইঞ্জিনিয়ার ছিল এবং চাষবাসের প্রয়োজনে খাল কেটেছিল বা কাটত— তাদের জ্ঞানভাণ্ডার নিয়ে তারা গর্বিত থাকত, সুনন্দ বরং আঁকড়ে ধরে থাকবে তার বিশ্বাসের জগৎটা। ছোটবেলার খেলার জিনিসগুলো মা যেমন যত্ন করে তুলে রেখেছেন এ অনেকটা তেমনই। ছোটবেলার একরত্তি জামা, একটা নকশা কাঁথা, রংচটা বল, ভাঙা এরোপ্লেন—মা এখনও ঝেড়েমুছে তুলে রাখেন। এ সব গল্প আর ধ্যান - ধারণাগুলোও ওর কাছে তেমনই প্রিয় ছেলেবেলার স্মৃতিরই ধারাবাহিকতা, দরকার নেই অথচ ফেলে দিতে মায়া!

উলুবেড়িয়া শহরটি বেশ ছিমছাম। বিডিও অফিসে পৌঁছে সুনন্দ গোটা কতক পঞ্চায়েতের ঠিকানা নিয়ে নিল। ওদের সঙ্গে ভালো করে কথা বলে নিতে হবে। চাষবাস, সার ইত্যাদির খোঁজখবর নিয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের পক্ষ থেকে একটা সুন্দর বিজ্ঞাপন তৈরি করতে হবে, একই সঙ্গে থাকবে পরিবেশ নিয়ে মানুষের সচেতনতা বাড়ানো এবং অগ্রগতির চিত্র—ওর একমাত্র চিন্তা, কত সুন্দর করে কাজটা করা যায়। আর্টিস্টকে বোঝাতে হবে ওর নিজের ধারণা। কল্পনা করে নেয় দিগন্তবিস্তৃত ধানখেত একগুচ্ছ পাকা ধান আর কাস্তে হাতে ধরা মাঠপ্রান্তে একটি মেয়ে —শহুরে চেহারা একদম নয়— গ্রাম্য সরল অথচ আশাদীপ্ত কর্মঠ গড়ন— মুখটা অনেকটা নীলার মত কি? ওখানে নীলাকে দাঁড় করালে কেমন দেখানে? নাঃ, হবে না। কারণ ওর চেহারায় একটা লতানো ভাব। তবে সুমি? দূর! অপরিণত অনভিজ্ঞ চেহারা। বরং মার চেহারাটা পোড়খাওয়া, অভিজ্ঞ, আত্মবিশ্বসী—চোখের দৃষ্টি অনেক দূরে, দেখতে পাচ্ছেন একটি স্বপ্নের সৌধ, মায়ের ছেলে সেখানে একজন সফল মানুষ, আত্মপ্রতিষ্ঠ। তার চোখেও কি স্বপ্ন সৌধ, মায়ের ছেলে

সৃষ্টিসন্ধান

সেখানে একজন সফল মানুষ, আত্মপ্রতিষ্ঠ। তার চোখেও কি স্বপ্ন আছে? হঠাৎই দেখতে পায় স্টেশন এসে গেছে। তাড়াতাড়ি নেমে একটা রিকশায় উঠে বসে। এরাই সবচেয়ে নির্ভরযোগ্য বাহন, যে কোনও গন্তব্যস্থান এদের নখদর্পণে— সামান্য পারিশ্রমিক বেশি দিলে সর্বত্র পৌঁছে দেবে। আর ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষাও করবে।

যতটা ঝামেলা হবে ভেবেছিল সুনন্দ আর কিছুই হল না। সুন্দর আপ্যায়ন পেল প্রতিটি সাক্ষাৎকারে। তাঁদের কৃতিত্বগুলো তুলে ধরা হবে শুনে সহযোগিতা করল যথেষ্ট। হিসাবনিকাশও মোটমুটিভাবে ঠিকঠাক রাখেন বেশিরভাগই। গত দু-তিন বছরের খতিয়ান, আগামীতে আনুমানিক উৎপাদন এবং অন্যান্য পরিকল্পনার তথ্য সংগ্রহ করতে কোনও অসুবিধা হল না। খানিকটা পথ ওকে পায়ে হেঁটে পেরতে হল। এমন অভিজ্ঞতা ওর ছিল না—গ্রামের পথে হেঁটে যেতে যেতে যেন অন্য জীবন আর ভিন্ন জগতের মধ্যে ঢুকে পড়ল সুনন্দ। ঝোপে ঢাকা সরু মাটির রাস্তা বেয়ে চলতে চলতে দেখে ছোট এক ডোবা— তিনদিকেই ঘিরে আছে বাঁশবন। তারই গা ঘেঁসা সজনে, চালতা-আমড়া গাছের জড়াজড়ি। পাড়ের গভীর জঙ্গলের খানিকটা সাফ করে খেজুর গাছের গুঁড়ি ফেলে ঘাট বানানো হয়েছে, সেখানে বসে বাসন ধুচ্ছে মাথায় ঘোমটা এক মহিলা। গোটা কয়েক হাঁস অনবরত ডুব দিয়ে গেঁড়ি-গুগলি তুলছে—পাশ দিয়ে কলমিলতার বেড়, তাদের কতগুলো আবার অনেকখানি ডোবার মাঝবরাবর লতিয়ে এগিয়ে গেছে— কিছু বেগুনি রঙের ফুল ফুটে আছে লতায়। খড়ে ছাওয়া ঘরের পিঠদেওয়ালে ঘুঁটে দিয়ে চলেছে নিপুণ হাতে এক বৃদ্ধা। সবকটি সমান মাপের সমদূরত্বে গিয়ে আটকে থাকছে, এক অপূর্ব শিল্পকর্ম। দুটি ছেলেমেয়ে আর একটি ছাগলছানা ওকে দেখে একপাশে সরে দাঁড়ায়। পরিপাটি নিকানো উঠোন পথ থেকেই চোখে পড়ে গ্রামের অতি সাধারণ দৃশ্য। আজ সুনন্দ এর মধ্যে অনেক কিছু দেখে ফেলল। এই যে সকলকে ডিঙিয়ে তাকে ওপরে উঠতে হবে—সর্বক্ষণের এই তাড়না—তাকে কোথায় নিয়ে যাবে? পথের শেষে কি আছে। জীবন না মৃত্যু না কি শুধুই কুয়াশাঢাকা আকারহীন স্তব্ধতা?

— 'স্যার ফিরছেন?' সকালে দেখা সামান্য এক অফিসকর্মী অত্যন্ত আন্তরিকভাবে ওকে জিজ্ঞাসা করে। যে কতদিনের পরিচয় এমনভাবে খবরাখবর নিতে থাকে। নগর সভ্যতায় এই ধরনের আলাপ অবশ্যই অমার্জিত কিন্তু সুনন্দর একটুও খারাপ লাগে না। বরং মায়ের কথা, তাদের ছোট্ট বাড়ির কথা, পড়াশুনায় না এগুনোর অক্ষেপের কথা অতি সহজেই বলতে বলতে পথ চলে। স্টেশনে পৌঁছেও দেখে লোকটার কোড়ও তাড়া নেই। যেন কোনও আপনজনকে ট্রেনে তুলে দিতে এসেছে। এত কথা বোধহয় কাউকে অনেকদিন বলা হয়নি। আজকাল মাকেও সব বলা যায় না—বোনকে তো নয়ই। আর নীলা? না একেবারেই না। অনেক ভেবেচিন্তে কথা বলতে হয়! আজ প্রশ্নটা বেশ বড় হয়ে ওর সামনে এসে দাঁড়াল—আচ্ছা এমনি কি চলবে? প্রতিটি পদক্ষেপ গুনে গুনে মেপে মেপে ফেলতে হবে? এই যাপনে সত্যিকারের আনন্দ মিলবে তো? সবাই কি এইভাবেই জীবন কাটিয়ে দেয়? নীলা তার প্রাচুর্যের জীবন, স্বাধীনতার জীবন ওর জন্য সম্পূর্ণ বিসর্জন দিতে পারবে কি? তার বয়স্ক মা নিশ্চয় আশা করবেন একটু বিশ্রাম, একটু শান্তি। অনুঢ়া বোনটাকে পাত্রস্থ করার দায়ও আছে। অহেতুক ভাবাবেগের চাইতে শক্ত জমিতে আগে দাঁড়ানো দরকার— কি সম্ভব আর কতটা সম্ভবপর — সব অনিশ্চিত— 'এই যে দাদা চুপচাপ না থেকে টুকটাক খান, গরমে জল পিপাসায় গলা ভেজান', বলে লজেন্সের একটা প্যাকেট এগিয়ে ধরে অল্পবয়সী একটি রোগা ছেলে। হঠাৎ ব্যস্ত হয়ে পকেট হাতড়ে টাকা বের করে এক প্যাকেট কিনে ফেলে সুনন্দ। একটা তাড়াতাড়ি মুখে ফেলতেই মনে হয় এরই যেন প্রয়োজন ছিল। লজেন্সের টক মিষ্টি ঝাল নোনতার পরিমাণ একেবারে সঠিক। একটা শেষ হতেই আর একটা মুখে ফেলে বাইরে তাকিয়ে থাকে। অন্ধকার ঘন হচ্ছে। দূরে দূরে বাজার, দোকানপাটের আলো দেখা যাচ্ছে। হাওয়া বেশ ঠাণ্ডা, ভিড় নেই। সারাদিনের ক্লান্তি ধীরে ধীরে কেটে যাচ্ছে— জীবনেও এমন টক মিষ্টি ঝাল স্বাদ থাকবে— কোনওটার মাত্রা বেড়ে গেলেই এই স্বাদু অনুভূতিটুকু আর থাকবে না। জীবন বোধহয় এমনই একপেশে, সঙ্গতি বা সামঞ্জস্যহীন। দুঃখগুলো চলে একটানা, দু-একটি আলোর আভাস আসতেই মিলিয়ে যায় আবার অন্ধকারে।

একটা ঘোর ঘোর ভাব হঠাৎ কোলাহলে ভেঙে যায়, ট্রেন হাওড়া স্টেশনে ঢুকে পড়েছে। আবার সেই ঘর। ঘামেভেজা শার্টটা একটানে খুলে ফেলে, প্যান্টটাও নামিয়ে দেয়। তোয়ালে নিয়ে সোজা বাথরুমে ঢুকতে গিয়ে দেখে সুমি ঘরের দরজায় দাঁড়িয়ে। মুখ দেকে মনে হল কিছু একটা বলতে এসেছে। না থেমেই ও সোজাই বাথরুমে ঢুকে গেল। দরজা বন্ধ করে শাওয়ারটা খুলে নিচে গিয়ে দাঁড়াল। ঝিরঝিরে ধারার মধ্যে খানিক দাঁড়িয়ে থেকে বেরিয়ে আসে মাথা মুছতে মুছতে। শরীরটা ঠান্ডা হয়ে গেছে, হয়তো মনটাও। ঘরে ঢুকে চিরুনি হাতে নিয়ে ভাবে, সুমি কি বলবে? হয়তো বলবে নীলা ফোন করেছিল নয়তো বলবে ফোন করেনি। এ মুহূর্তে এ দুটোর বিশেষ কোনও অর্থ নেই তার কাছে।

সৃষ্টিসন্ধান